শূর্পণখা

‘জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা’,
কহিলা বাল্মীকি, ‘তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে!
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।’
নারদ কহিলা হাসি, ‘সে-ই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।’

‘ভাষা ও ছন্দ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

'তোমার কাছে আমার একটা যাচনা ছিল মা।' কাতর কণ্ঠে বললেন সুমালী।

চকিত চোখে পিতার দিকে তাকালেন কৈকসী। পিতা তো তাঁর সঙ্গে এরকম ভাষায় কথা বলেন না কখনো! তাঁদের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়, তাতে থাকে বাৎসল্য এবং পিতৃশ্রদ্ধা। পিতা আর কন্যার সম্পর্কের মধ্যে যাচনা, প্রার্থনা, ভিক্ষা—এসব শব্দ আসবে কেন?

মাথা নিচু করলেন কৈকসী। ভাবে, দেহভঙ্গিতে পিতার কথা বুঝতে না-পারার আভাস।

সুমালী বললেন, 'কিছু বলছ না কেন নিকষা?'

অন্যরা কৈকসী নামে ডাকলেও মহারাজ সুমালী তাঁর আদরের এই কন্যাটিকে নিকষা বলে সম্বোধন করেন।

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা!' মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন কৈকসী।

'কী বুঝতে পারছ না মা?'

'যাচনা শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন বুঝতে পারছি না!'

'অর্থ তো জান?'

'জানি বাবা। এই শব্দ দিয়ে প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন এমনকি ভিক্ষাও বোঝায়।'

'তাহলে তো বাক্যটির মর্মার্থ তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছ।'

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কৈকসী বললেন, 'যাচনা শব্দটির ওই অর্থ বলেই আপনার কথার মানেটি ধরতে পারছি না বাবা!'

রাজা অথই জলে পড়ে গেলেন। মেয়ের কথাগুলো রহস্যময়, হেঁয়ালিপূর্ণ বলে মনে হতে লাগল সুমালীর।

বিহ্বল চোখে আত্মজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো উপায় থাকল না।

এবার কাঁদতে শুরু করলেন কৈকসী। প্রথমে ফুঁপিয়ে, পরে আকুল হয়ে।

হতভম্ব হয়ে গেলেন সুমালী। মেয়ে কেন এরকম ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, বুঝতে পারলেন না। কন্যাকে ধমক দেবেন, না ব্যগ্র দু'বাহু বাড়িয়ে বুকে জড়াবেন—সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সুমালী। শুধু বিব্রত, ত্রস্ত চোখে কৈকসীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মহারাজ বললেন, 'তুমি থাম মা। থাম নিকষা। আমি তো তোমায় কষ্ট পাওয়ার মতো কোনো কথা বলিনি! তার পরও তুমি এরকম বুক ভাসিয়ে কাঁদছ কেন বুঝতে পারছি না মা!'

দ্রুত হাতে দু'চোখ মুছে নিলেন কৈকসী। অভিমানক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমার কাছে প্রার্থনা করলেন কেন বাবা? আমার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার থাকলে নির্দেশ করবেন। প্রাণ দিয়ে আপনার ইচ্ছা পূরণ করব আমি। আপনি যে আমার জন্মদাতা, প্রিয় পিতা!'

হো হো করে হেসে উঠলেন রাক্ষসরাজ সুমালী।

'ও—! এই কথা! পাগলি মা আমার!'

'বলুন বাবা, কী বলতে চান, মন খুলে বলুন।'

'আমার পছন্দের লোকটিকে বিয়ে করবে তুমি নিকষা?'

কৈকসীর ভাবনার মধ্যে এটা ছিলই না যে, তাঁর পিতা তাঁকে সরাসরি বিয়ের কথা বলবেন। ভেবেছিলেন—রাজ্যপাট, প্রাসাদাভ্যন্তরের কোনো সংকটের কথা অথবা তাঁর ভাইবোন বা মায়ের ব্যাপারে কোনো বিষয়ের অবতারণা করবেন। তা না করে পিতা তাঁর পছন্দের লোকটিকে বিয়ে করতে কাকুতি করছেন।

লোকটি! তাঁর ভবিষ্য-বর লোকটি হবে কেন? যুবক হবে না কেন? সে নিজে যুবতি এবং অনূঢ়া। সেই সুবাদে তাঁর বরটিও তো যুবক হওয়ার কথা! কিন্তু বাবা যে বললেন লোকটি? 'লোকটি' শব্দের মধ্যে বয়স্ক লোকের অস্তিত্ব অনুমান করলে তো ভুল হবে না! তাহলে কি তাঁর পিতা তাঁকে বয়সি কারো সঙ্গে বিয়ে দিতে চান? লোকটি নিশ্চয়ই রূপে-যৌবনে তাঁর উপযুক্ত নন। আর উপযুক্ত নন বলেই পিতার কণ্ঠে এ ধরনের মিনতি।

পিতাকে বললেনও তা কৈকসী, 'বাৎসল্য দিয়ে লালনপালন করেছেন আমাকে। আমি যুবতি এখন। উপযুক্ত বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বাবা এবং আপনি সেই দায়িত্ব পালন করতে উদ্যোগীও হয়েছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।' বলে থেমে গেলেন কৈকসী।

মহারাজ সুমালী দ্রুত মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না মা?'

'আমার বরের কথা বলতে গিয়ে লোকটি বললেন কেন? কোনো বয়স্ক লোককে কি আপনি আমার ভবিষ্য-স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছেন?'

চার কন্যার মধ্যে মহারাজ সুমালী দ্বিতীয়কন্যা কৈকসীকে বেশি ভালোবাসেন। কৈকসী বিচক্ষণতায় সব কন্যার মধ্যে সেরা। কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎঘটা ও রাকা—সুমালীর এই তিন মেয়েও রূপসী এবং যৌবনবতী। সৌন্দর্যে এই তিন বোনের চেয়ে কৈকসী বেশটুকু বাড়া। তাঁর রূপময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিমত্তা। রূপ ও বিচক্ষণতার সমন্বয়ে কৈকসী রাজকন্যাদের মধ্যে অতুলনীয় হয়ে উঠেছেন। মহারাজ সুমালী তাঁর এই কন্যাটির বিচক্ষণতার কথা আগে থেকেই জানতেন। তাই আজ কৈকসীর কথা শুনে অবাক হলেন না। একটি শব্দের মধ্যে থেকে যে বরটির বয়স অনুমান করে ফেলবে কৈকসী, জানতেন সুমালী। তাই ইচ্ছে করে 'বর' শব্দটি ব্যবহার না করে 'লোকটিকে' ব্যবহার করেছেন। তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সুমালী কৈকসীর জন্য যাঁকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, আসলেই তিনি বয়স্ক, বিবাহিত এবং অনেক সন্তানের জনক।

কন্যার কথা শুনে মাথা নিচু করলেন সুমালী। তারপর কৈকসীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যথার্থ বলেছ মা। যাঁকে বিয়ে করার জন্য তোমাকে অনুরোধ করছি, তিনি গৃহজীবী নন, অরণ্যবাসী। তরুণ নন, প্রবীণ। ধনৈশ্বর্য নেই তাঁর, কিন্তু তিনি জ্ঞানবান।'

'আর শুনতে চাই না বাবা।' পিতাকে থামিয়ে দিয়ে কৈকসী বললেন, 'তাঁর নাম-পরিচয়টা কি বলবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। তাঁর নাম না বললে চিনবে কী করে তুমি তাঁকে? আর নাম বললে আপনাতেই তাঁর পরিচয় পেয়ে যাবে।' ঢোক গিললেন মহারাজ। টানাপড়েনে পড়লে মানুষ ঢোক গেলে। রাজাও সংকটে পড়েছেন। বরের নাম শুনে যদি কৈকসী তাঁকে বিয়ে করতে রাজি না হন!

কৈকসী অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন দেখে সুমালী আর ভূমিকা করতে সাহস করলেন না। সাবধানী কণ্ঠে বললেন, 'তিনি মহামুনি বিশ্রবা। ঋষি বিশ্রবাকে বিয়ে করতে তোমার কাছে যাচনা করছি মা।'

কৈকসীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'মহামুনি বিশ্রবা! বিবাহিত একজন লোককেই বিয়ে করতে বলছেন আপনি আমাকে!'

'হ্যাঁ মা। আমি জেনেবুঝেই বলছি।'

'কারণ?' স্তম্ভিত কৈকসী।

'এই বিয়ের পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। বলতে পার মহাপরিকল্পনা। সুদূরপ্রসারী। তাতে রাক্ষসজাতির অশেষ কল্যাণ হবে ভবিষ্যতে। তুমি রাক্ষসসমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য ঋষি বিশ্রবাকে বিয়ে কর মা। তাতে আমি খুশি হব।'

'আপনাকে অখুশি করব না বাবা। আপনার পছন্দের লোকটিকেই আমি বিয়ে করব। কিন্তু এই বিয়ের পেছনে আপনার উদ্দেশ্যটা কী? কীসের পরিকল্পনার কথা বলছেন আপনি?'

'উদ্দেশ্যের কথাটি আপাতত তোমার অশ্রুতই থাকুক নিকষা। শুধু জেনে রাখ, এই বিয়ের মাধ্যমে তোমার গর্ভজাত সন্তানরা ত্রিভুবন কাঁপাবে। এক নামে সসাগরা পৃথিবীর মানুষ তোমার সন্তানদের চিনবে। রাক্ষসজাতি ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

'কিন্তু বাবা, ঋষি বিশ্রবা আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হবেন কেন? তিনি তো বিবাহিত! সন্তানও আছে তাঁর।'

'তোমার বলায় কোনো ভুল নেই নিকষা। ঋষি বিশ্রবা মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের বৈশ্রবণ নামে একটি পুত্রও আছে।'

'বৈশ্রবণ! আমি শুনেছি তার নাম...।'

কৈকসীর মুখের কথা কেড়ে নিলেন সুমালী, 'বৈশ্রবণের আরেকটা নাম আছে—কুবের। ব্রহ্মার তপস্যা করে কুবের এখন অঢেল সম্পদের মালিক। সে এখন লঙ্কার রাজা।'

'লঙ্কার রাজা! আপনারা তিন ভাই না লঙ্কার রাজা ছিলেন!'

'তা এখন অতীত হয়ে গেছে মা। লঙ্কা থেকে বিতাড়িত আমরা।' দীর্ঘ একটা শ্বাস বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো সুমালীর। ডানে-বাঁয়ে জোরে জোরে

মাথা ঝাঁকালেন। দুঃসহ এক অপমানকে মাথা থেকে বের করে দিতে চাইলেন সুমালী। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওই কুবেরকে দেখেই বিশ্রবা মুনিকে বিয়ে করতে অনুরোধ করছি তোমায়।'

'কুবেরকে দেখে!' বিস্ময়ের ঢেউ একের পর এক কৈকসীর মাথায় আছড়ে পড়ছে যেন।

'ঋষি বিশ্রবা তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত হবেন কিনা, জানতে চেয়েছিলে না তুমি?'

'হ্যাঁ বাবা, তা-ই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে!'

'তিনি সম্মত না হলেও সম্মত করাতে হবে তাঁকে। তাছাড়া মুনিঋষিরা...।' কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন সুমালী।

'তাছাড়া মুনিঋষিরা বলে থেমে গেলেন কেন বাবা? আর কিছু কি বলতে চেয়েছিলেন?'

করুণ চোখে কন্যার দিকে তাকালেন একবার সুমালী। মনের জড়তা দ্রুত ঝেড়ে ফেললেন, 'ঋষিরা কোনো নারীকে না করেন না। বিশেষ করে রূপসী, যৌবনবতী...! ঋষি বিশ্রবা রাজি না হলেও ছলে-কৌশলে তোমাকে বিয়ে করতে তাঁকে রাজি করাবে তুমি।'

কৈকসী বললেন, 'ঋষি বিশ্রবা কুলীন ব্রাহ্মণ। তার ওপর খ্যাতিমান আর্যমুনি। তাঁকে কী করে অনার্য রাক্ষসকন্যাকে বিয়ে করতে সম্মত করাব! ওঁদের মধ্যে তো কৌলীন্যবোধ আর জাতপাতের চিন্তা অত্যন্ত প্রকট।' বিদ্যাবতী কৈকসী। তাঁর সমাজাভিজ্ঞতা গভীর এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ। অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণশক্তির বলে ব্রাহ্মণ্যরীতিনীতি তাঁর ভালো করেই জানা।

মহারাজ সুমালী এবারও না হেসে পারলেন না। টেনে টেনে হেসে গেলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, 'সমাজাভিজ্ঞতার জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি মা। অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজমানুষের অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে তোমার, মানি তা। কিন্তু ঋষিচরিত্র সম্পর্কে তোমার জানাটা সম্পূর্ণ হয়নি। বামুন জাতের এই মানুষগুলো কী পরিমাণ স্বার্থপর এবং কী পরিমাণ লোভী, তা তুমি ভাবতেই পারবে না। অনার্য নারীর কথা বলছিলে না তুমি? জেনে রাখ, ভোগের ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আর্য-অনার্য বলে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই

সমান আকর্ষণীয়। শাস্ত্রে, মন্ত্রে তাঁদের রুচিহীন ভোগবাদিতার ব্যাপারটিকে আইনসিদ্ধ করে রেখেছেন তাঁরা।'

এরপর অনুচ্চ কণ্ঠে মহারাজ সুমালী বললেন, 'আমার একজন কুবেরের মতন নাতি চাই। শক্তিধর, পৃথিবীকাঁপানো নাতি। রাজ্যহারানোর যে অপমান দীর্ঘদিন ধরে আমাকে চূর্ণ করে যাচ্ছে, সেই অপমানের হাত থেকে আমি মুক্তি চাই মা। একমাত্র তুমিই পারবে সেই অপমান থেকে আমাকে মুক্তি দিতে। তোমার সন্তানই পারবে শুধু আমার হারানো ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিতে।'

কৈকসী বললেন, 'বাবা বিড়বিড় করে কিছু বলছিলেন?'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, না না মা! তোমার কাছে আমার এইটুকুই চাওয়া— তুমি বিশ্রবার পত্নী হও। আমাকে একজন বীর্যবান নাতি উপহার দাও।'

পিতার পরামর্শে কৈকসী এক সন্ধ্যাবেলায় বিশ্রবার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

দুই

সুকেশ ও দেববতীর সন্তান সুমালী। এই দম্পতির তিন পুত্র—মাল্যবান, সুমালী এবং মালী।

সুকেশ রাক্ষসজনজাতির মানুষ। তাঁর পিতার নাম বিদ্যুৎকেশ। যৌবনকালে বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার বিয়ে হয়। এঁর জীবন বহির্মুখী। ভ্রমণ, বিহার, নাচ-গান—এসবের প্রতি তাঁর অদম্য মোহ। বাৎসল্য তাঁর হৃদয়ে তেমন কোনো স্থান করে নিতে পারেনি। স্বামীর সঙ্গে মন্দর পর্বতে বিহারের সময় সুকেশের জন্ম হয়। ওখানেই পুত্রকে পরিত্যাগ করে বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে আনন্দ-উচ্ছলতায় মগ্ন হয়ে যান সালকটঙ্কটা। এবং অচিরেই অন্য স্থানে বিহারার্থে চলে যান। পরিত্যক্ত সুকেশ হর-পার্বতীর ঘরে মানুষ হন। পরবর্তীকালে গ্রামণী নাম্নী এক গন্ধর্বের কন্যার সঙ্গে সুকেশের বিয়ে হয়। এই গন্ধর্বকন্যার নাম দেববতী।

মাল্যবান, সুমালী ও মালী ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। বাল্যকালেই তাঁদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা দেখা গেল। যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁরা যেমন তেজস্বী, তেমনি উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। উৎকট স্বেচ্ছাচারিতা তাঁদেরকে ভয়ংকর করে তুলল। বাহুবল, রণদক্ষতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুকেশ রাক্ষসের এই তিন পুত্রকে অন্ধ করে ছাড়ল। মাল্যবান সুবিবেচক, পণ্ডিতধরনের। ভেবেবুঝে সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দূরদর্শিতা তাঁকে অন্য দুই ভাই থেকে আলাদা করেছে। সুমালী প্রতিষ্ঠাপরায়ণ। ক্ষমতার প্রতি তাঁর উদগ্র লোভ। ঈর্ষাপরায়ণও তিনি। আর মালী চণ্ডস্বভাবী। পাণ্ডিত্য, রাজ্য, ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, যুক্তিবাদিতা—এসবের ধার ধারেন না মালী। তাঁর চাই রক্ত, চাই যুদ্ধ। তাঁর যত তৃপ্তি ওই যুদ্ধে, ওই মনুষ্যনিধনে।

স্বভাব-চরিত্রে তিন ভাই তিন রকম হলেও একটা ব্যাপারে তিনজনের মিল আছে। তা হলো—তাঁদের একটা স্বাধীন রাজ্য চাই, একটা রাজসিংহাসন চাই।

মালী বললেন, 'তা নিয়ে এত ভাববার কী আছে দাদারা? চল যুদ্ধে নেমে পড়ি।'

সুমালী বললেন, 'যুদ্ধে নেমে পড়বে!'

'তাই তো। আমাদের অগণন যোদ্ধা। সবাই রাক্ষসজনজাতির। ওরা রণদক্ষ। উগ্রস্বভাব তাদের। যুদ্ধলিপ্সুও।' বললেন মালী।

সুমালী চোখ নাচিয়ে বললেন, 'তাতেই যুদ্ধে জয় পেয়ে যাবে বলে তুমি মনে কর?'

'তাছাড়া আর কী?'

'আরে ভাই, শুধু বাহুবল দিয়ে জয় মেলে না! প্রয়োজন বুদ্ধিবলেরও।' এতক্ষণ পর কথা বললেন মাল্যবান।

'দাদা, রাজ্যজয়ের জন্য দরকার সৈন্যশক্তি আর রণকুশলতা। ওই দুটোই আমাদের আছে। পররাজ্য দখল আমাদের কাছে একটা চুটকির ব্যাপার মাত্র।' সদম্ভে বলল মালী।

'তোমার এ ধারণা ভুল মালী। রণকুশলতার জন্য দরকার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা। সেটা তোমার নেই।' মাল্যবানের কণ্ঠস্বর উষ্ণ।

ভড়কে গেলেন মালী। বললেন, 'আমার নেই!'

'না নেই। তোমার আছে অশেষ শারীরিক শক্তি। বাহুবলীও তুমি। এই বাহুবলের সঙ্গে যখন বুদ্ধিশক্তির মিশ্রণ ঘটে, তখন ওই ব্যক্তি সমরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ওই রণবিচক্ষণতা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি সুমালী।' মালীর দিক থেকে সুমালীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন মাল্যবান।

'ওটা যে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন দাদা! ওটা না হলে আমরা পররাজ্য দখল করব কী করে? আমার যে রাজা হবার প্রবল বাসনা দাদা!' মনের কথা খুলে বলতে দ্বিধা করলেন না সুমালী।

মাল্যবান সুমালীর কথার সরাসরি উত্তর দিলেন না, 'এই ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্য আর্যশাসকদের কবলে। দেবতারা তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু। অনার্যে-আর্যে যুদ্ধ বাধলে ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা আর্যদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁদের যুদ্ধবিচক্ষণতার সামনে অনার্যরা দাঁড়াতে পারে না।'

'তাহলে উপায়!' হতাশভঙ্গি সুমালীর চোখেমুখে।

'উপায় একটা আছে।' বললেন মাল্যবান।

মালী বলে উঠল, 'আছে! সেটা কী দাদা?'

'ইন্দ্র অথবা ব্রহ্মা—এই দুজনের একজনকে তুষ্ট করা।' মুখ গম্ভীর করে বললেন মাল্যবান।

'ওঁরা দেবতা! আমাদের মতো রাক্ষসে তুষ্ট হবেন কেন তাঁরা? আর তুষ্ট করবই-বা কী দিয়ে?' সুমালীর প্রশ্ন।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মাল্যবান বললেন, 'আরাধনা দিয়ে। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট করব আমরা দেবতাকে।'

'কোন দেবতা আমাদের আরাধ্য হবেন? কাকে তৃপ্ত করলে আমাদের মনস্কামনা পূরণ হবে দাদা?' সুমালী বললেন।

মালী বললেন, 'তুমি দুজন দেবতার নাম বলেছ—ইন্দ্র আর ব্রহ্মা। দুজনের মধ্যে আমার ব্রহ্মাকে পছন্দ। ইন্দ্র নারীলোভী। ধূর্ত। অনার্য-উত্থান তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। আমাদের তপস্যায় তিনি কখনো তুষ্ট হবেন না। আমরা কোনোভাবেই তাঁর মন গলাতে পারব না দাদা।'

মাথা নেড়ে মাল্যবান বললেন, 'এতদিনে তুমি যথার্থ একটা কথা বলেছ মালী। তুমি ভালো করেই ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছ। নারীভোগের সময় আর্য-অনার্যের বাছবিচার থাকে না ইন্দ্রের। কিন্তু পক্ষাবলম্বনের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই আর্য স্বার্থ দেখেন। তাই আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের দ্বারস্থ হব না। আমরা মহাপ্রতাপশালী দেবতা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হব।' দম নেওয়ার জন্য থামলেন মাল্যবান।

এই ফাঁকে সুমালী বললেন, 'তাঁর নৈকট্য পাওয়ার জন্য আমাদের করণীয় কী হবে দাদা?'

'তপস্যা। তপস্যা ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়ে ব্রহ্মার মন নরম করা যাবে না। অনুরাগী ভক্তদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। ঐকান্তিক সাধনায় আমরা যদি এই মহাপ্রাণ দেবতাশ্রেষ্ঠের মনতোষণ করতে পারি...।'

'তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, মনস্কামনা পূরণ হবে আমাদের, এই তো বলতে চাইছ দাদা তুমি?' সুমালী বললেন।

'অর্থাৎ আমরা রাজ্যজয়ের শক্তি পাব! দুর্দমনীয় হয়ে উঠব আমরা! শত্রুহন্তা হতে পারব!'

মালীকে আর বলার সুযোগ দিলেন না মাল্যবান, 'তাই রে ভাইয়েরা, তাই! ব্রহ্মার আশীর্বাদ পেলে আমরা অজেয় হব। শত্রুঘ্ন হব। রাজা হওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে।'

আবেগে কেঁদে ফেললেন সুমালী। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'রাজা হবার বড় বাসনা আমার! আমি রাজমুকুট পরে মাথা উঁচু করে সিংহাসনে বসব, তুমি আমার পাশে মুক্তাখচিত আসনে বসে আমাকে উপদেশ দিয়ে যাবে!'

'আর আমি সেনাপতি হয়ে তোমার রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করে যাব।' উচ্ছ্বাসে বিভোর হয়ে মালী বলে উঠল।

মাল্যবান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সব কিছু হবে আমাদের। তুমি রাজা হও—সেটা আমি মনেপ্রাণে চাই। রাজা হবার সকল যোগ্যতা তোমার আছে ভাই। সে যোগ্যতা আমার নেই। এসবের আগে আমাদের যেটা করতে হবে, তার নাম—সাধনা। কঠোর তপস্যার মাধ্যমে মহাদেবতা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদ নিতে হবে আগে। তার পর রাজ্যজয়, রাজসিংহাসন।'

এরপর তিন ভাই সুমেরু পর্বতের উদ্দেশে রওনা দিলেন। যাত্রার আগে পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনজনে।

তিন পুত্রকে করপুটে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন সুকেশ।

বললেন, 'কিছু বলবে তোমরা?'

সুমালী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা। আপনার অনুমতির জন্য এসেছি আমরা।'

'অনুমতি! কীসের অনুমতি?'

সুমালী বললেন, 'আমি ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারব না। দাদা মাল্যবান আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবে।'

মাল্যবানের ওপর চোখ স্থির করলেন সুকেশ। সেই চোখে জিজ্ঞাসা।

জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে বড় ভালোবাসেন সুকেশ। সুমালী উচ্চাভিলাষী। মালী উগ্র। মাল্যবান শান্ত। সুবিবেচক। অন্য দুই ছেলের মতো এই ছেলেটির শরীরেও প্রচণ্ড শক্তি। শারীরিক শক্তি মালী-সুমালীকে অহংকারী করে তুললেও মাল্যবান নিরহংকারী থেকে গেছেন। এই জন্য মাল্যবান সুকেশের কাছে প্রিয়তর হয়েছেন। প্রিয় পুত্রের বক্তব্য শুনবার জন্য সুকেশ উৎকর্ণ হলেন।